জানুয়ারি মাসেই জন্ম নিয়েছিলেন দুই জাতীয় যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষ চন্দ্র বসু। যদিও এই দুই মনিষীর কথা আজও জাতীয় স্তরে যথোপযুক্তভাবে প্রচারিত হয়নি, তথাপি আশার বিষয় এই যে – এঁদের আদর্শে মানুষের বিশ্বাস বাড়ছে।

ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন আজ খুবই জরুরি। সম্প্রতি দিল্লীর গণধর্ষণের মামলায় দেশের উচ্চতম আদালতের রায় সামাজিক ন্যায়ের এক যুগোপযোগী নজির সৃষ্টি করেছে।

আসুন, সমস্ত প্ররোচনামূলক শব্দকে উপেক্ষা করে, সগর্বে বলি – "এখনও আশা আছে।"

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৮
জানুয়ারি ২০২০

আশা সংখ্যা

কলম হাতে

মালা মুখার্জী, নাহার আলম, স্বাগতা পাঠক, দোলা মুখার্জি, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সুচিতা সরকার এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

বই মেলায় 'থীমা'র স্টলে পাওয়া যাচ্ছে
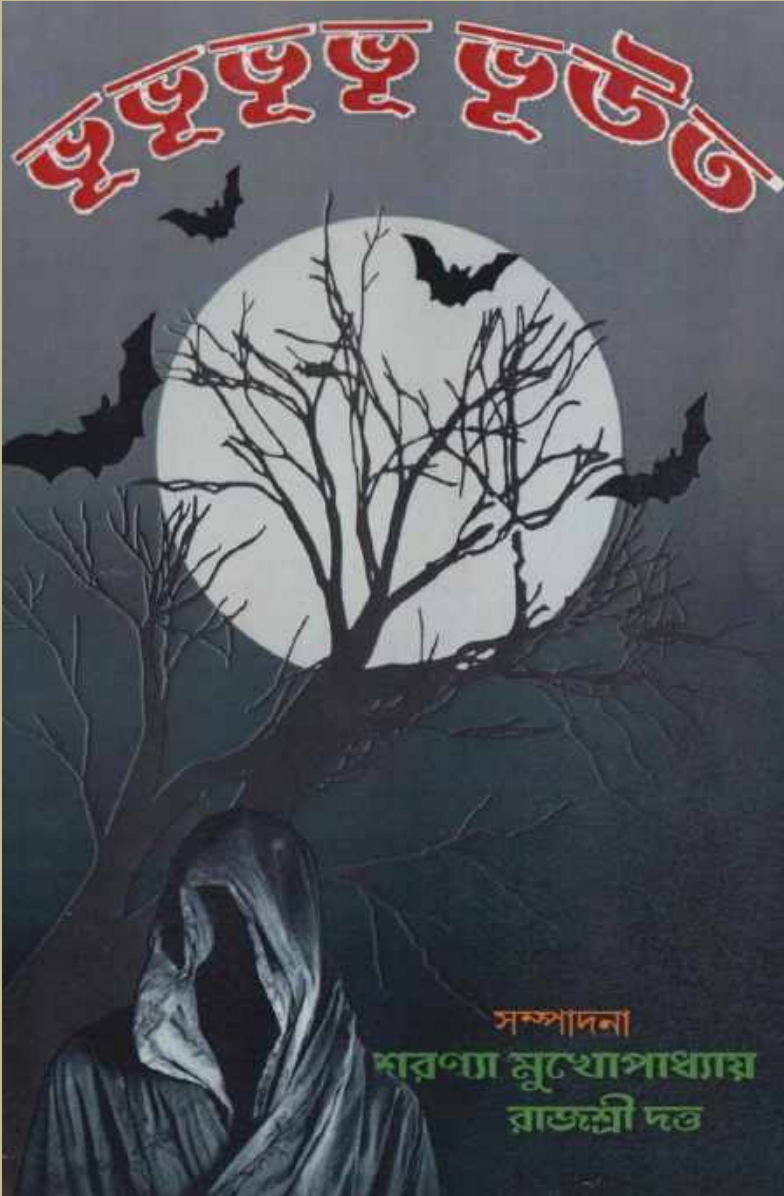
মূল্যঃ ৮০ টাকা [এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ডেলিভারি চার্জ লাগবে।]

লিঙ্ক (Just copy and paste to your browser):
https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

বই মেলায় স্টল নং ৪৭৭ এ পাওয়া যাচ্ছে

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলায় 'অরণ্যমনের' স্টল (৪৭৭) থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলেজ স্ট্রীটে এবং কলকাতার বিভিন্ন বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাবে...

পায়ে পায়ে

নতুন বছরে (ইংরাজী) নতুন আশা নিয়ে ‘পাণ্ডুলিপি’ ও ‘গুঞ্জন’ এগিয়ে চলেছে নতুন প্রগতির পথে। আজ শুরুতেই, বছরের প্রারম্ভে সকল সদস্য–সদস্যাগণকে, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে এবং একনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকাদের পাণ্ডুলিপির পক্ষ থেকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ডিসেম্বর সংখ্যায় পেয়েছি নানা ধরনের অণুগল্প। বছরের শুরুতে “শিশু মনের হালখাতা” দিয়ে গ্রুপের বর্ষবরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত একটি লেখা আমাদের ‘গুঞ্জন’ জানুয়ারি সংখ্যাতে প্রকাশ করা হল।

বিদ্যাদেবী মা সরস্বতীর আরাধনা পক্ষে বইমেলা প্রাঙ্গণে অরণ্যমন প্রকাশনী থেকে আমাদের "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে ২৯/০১/২০২০ তারিখে। আমরা আপ্লুত যে এই শুভক্ষণে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অনুবাদক শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ওপার বাংলার বিখ্যাত প্রকাশক ও লেখক শ্রী শামসুদ্দিন শিশির (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ) মহাশয়কে পাশে পেয়েছি। দুই বাংলার যুগ্ম সাহচর্যে "রহস্যের ৬ অধ্যায়" বইটির মোড়ক উন্মোচন সম্পন্ন হলো। এছাড়া আমাদের উৎসাহিত করার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বাংলার সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রী পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত (সম্পাদিকা, গুঞ্জন)

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ https://ccsearch.creativecommons.org/photos/abd9fa57-b5d3-4221-b123-1ceb481547ea

দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৭)

সময় নষ্ট না করে খুব সকালেই এই ইলাইয়া গ্রাম থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। ভোর ৫.৩০, তাই সূর্য ওঠার প্রশ্ন নেই। ঠাণ্ডায় যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় তাই "শুরু হোক পথ চলা"। আজ শনিবার ৭ তারিখ, সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে ভালই লাগছে। রাস্তাও ভাল, তবে ভীষণ ভীষণ চড়াই। একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে জঙ্গল। "মুণ্ডমারন্যের জঙ্গল"। মাঝখান দিয়ে চলেছে পিচ ঢালা রাস্তা। সব পরিক্রমাকারীর কাছেই মস্ত বড় পরীক্ষা মুণ্ডমারন্যের জঙ্গল, শূলপানীর ঝাড়ি আর ওঙ্কারেশ্বরের ঝাড়ি। কোন গ্রাম নেই, আমরা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছি। প্রায় আট কিলোমিটার চলা হয়ে গেল। কিসুল্পরী নামে একটি গ্রামে চা পানের বিরতি নিলাম। একবার বসলে আবার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, সমস্ত পেশীগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে। তাই জপ করতে করতে মনটাকে অন্য দিকে রেখে এগিয়ে চলছি।

আজ সকাল থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি হাঁটতে কষ্ট হলেও হাঁটার ইচ্ছেটা থেকেই যাচ্ছে। দুপুর পেরিয়ে গেছে প্রায় বিকেল, বারো কিলোমিটার পেরিয়ে একটি গ্রামে এলাম, নাম রাইগ্রাম। হাট বসেছে, স্কুল, থানা সবই আছে। রাস্তার পাশে

নমামি দেবী নর্মদে

নর্মদা মায়ের মন্দিরে বিশ্রাম নিচ্ছি। অন্যদিন হলে আর যেতে পারতাম না, কিন্তু আজ চলার ইচ্ছেটা প্রবল – তাই চা খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এবারে উৎরাই, সূর্যাস্তের এখনও দেরী আছে, খোলা হাওয়াতে লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি অনন্তের দিকে। জঙ্গলে ময়ূর দেখলাম। এখন এই জঙ্গলে কোন নরখাদক আছে কিনা জানিনা। চলতে চলতে এক পরিক্রমাকারী সাধুর সাথে আলাপ হল, উনি জলেহরি পরিক্রমা করছেন। উনি বললেন এই জঙ্গলে এমন কিছু উচ্চকোটির মহাত্মা আছেন যাঁরা পরিক্রমাকারীকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি প্রদান করেন, যাতে তারা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটা সকাল থেকেই আমরা লক্ষ্য করছিলাম, এত কষ্টতেও হাঁটতে ভাল লাগছে। আমাদের বাঙালি সঙ্গী নিরঞ্জন তার এক পুরানো বন্ধুকে পেয়ে তার কুঠিরে চলে গেল গাঞ্জা খেতে। আমাদেরও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দিব্যানন্দজী ও নতুন সঙ্গী সাধুটি কিছুতেই আমাদের ওই কুঠিরে যেতে দিলেন না। তাই আমরা এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এবারে বিশ্রামের দরকার, ২৭ কিলোমিটারের বেশী হাঁটা হয়ে গেল আজ।

সাধুটি আমাদের একটি পরিত্যক্ত কুঠিরে নিয়ে এসে তুললেন, পাশে একটি শিব মন্দির আছে। গ্রামের নাম "হরা"। পরিক্রমাকারী এসেছে শুনে গ্রামের কিছু লোকজন এসে হ্যারিকেন, চাল, আনাজ এবং একটি হাঁড়ি দিয়ে গেল পরিক্রমাকারীর সেবার জন্য। আমাদের সাথে দুইজন সন্ন্যাসী

নমামি দেবী নর্মদে

আছেন আর আমি এবং কাকাজি সংসারি মানুষ। আমার তো না আছে কোন তপবল, না আছে পূর্ব জন্মের কোন সুকৃতি। গুরুর কাছে শুধু বলে চলেছি, "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না"। গুরুর আশীর্বাদে এবং মা নর্মদার কৃপায় পরিক্রমার সুযোগ পেয়েছি। এই পরিক্রমা কবে শেষ করব বা আদৌ শেষ হবে কিনা কিছুই জানি না, জানতে চাইও না।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

শুনুন শিল্পীর কণ্ঠে আরও কিছু সুন্দর গান

https://www.youtube.com/watch?v=mp0Ig1UCHbk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=Ost25llB7rQ

https://www.youtube.com/watch?v=H_Oi5hUbCj0

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

মেবার ভ্রমণ

চিতোর পর্ব (১ম ভাগ)

মালা মুখার্জী

তখন ভোর ছটা, রাজস্থানে শীতকালে সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে আলো ফোটে না। আমরা চা পেলাম না, বেড-টি ছ'টার আগে হয় না। ভালো করে কোট জড়িয়ে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটা দিলাম দুজনে। গাড়ী নেই, রিক্সা বা অটোও নেই। হোটেল থেকে বাসস্ট্যাণ্ড হাঁটা পথ। শীতের হিমেল হাওয়ার পরশ বাঁচিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম, তখনও চিতোরের বাস আসেনি। বাসস্ট্যাণ্ডে লোকজন কম্বল মুড়ি দিয়ে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে বসে, কেউ কেউ আগুন পোহাচ্ছে, কেউ বা চা খাচ্ছে।

আমি টিকিট ঘর থেকে জেনে এলাম কোন প্ল্যাটফর্মে বাস থামবে। টিকিট গুমটির লোকটি ঢুলু ঢুলু চোখে বলল, “বাহর দেখিয়ে, বানসয়ারা লিখা হ্যায়।” হ্যাঁ, দূরপাল্লার বাসেরও প্ল্যাটফর্ম আছে।

হ্যাঁ, আমাদের বাসের অন্তিম গন্তব্য বানসয়ারা, পথে পড়বে চিতোরগড়। আমি বানসয়ারা যাইনি, তবে নেট সার্ফ করে দেখলাম ত্রিপুরসুন্দরী মায়ের মন্দির আছে ওখানে, যা

অন্যতম শক্তিপীঠ। ওখানেও লেক আর প্যালেস আছে, এসবের বর্ণনা অফবীট রাজস্থানে দেবো, এখন মেইন ট্যুরিষ্ট স্পটের কথাই শুধু লিখবো।

যথা সময়ে বাস এল এবং ছাড়লো। সকালের আলো ফুটছে, প্রথমে নরম রোদ, পরে কাঠফাটা। আজমীর শহরকে পিছনে ফেলে হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে বাস, পরবর্তী গন্তব্য ভীলওয়াড়া, বা ভীল উপজাতির আদি বাসভূমি। আমি লেখার শুরুতেই টড সাহেবের অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যান্টিক অব রাজস্থান ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনীর উল্লেখ করেছি। কেউ যদি এর একটি বইও পড়ে থাকেন তো জানবেন এই ভীলদের সাথে মেবারের রাণাদের সুখ-দুঃখের সম্পর্ক। ভীলেরা যেমন দায়বিপদে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাজাদের বিধবা ও নাবালক উত্তরাধিকারীদের আশ্রয় দিয়েছে, তেমনি কোনো কোনো ভীল রমণী রাজরানিও হয়েছে, ভীল যোদ্ধারা সেনাপতিও হয়েছে। আধুনিক ভীলওয়াড়া অবশ্য জঙ্গল নয়, বস্ত্রশিল্পের শিল্পনগরী।

ভীলওয়াড়া পৌঁছনোর আগেই ঘটল এক ভয়ানক কাণ্ড। বাস হঠাৎ থেমে গেল, ইঞ্জিন থেকে উঠতে লাগলো গলগল করে ধোঁয়া আর সঙ্গে যাত্রীদের আর্তনাদ, *বাস মেঁ বম্ব হ্যায়*। জিনিসপত্র ফেলে পার্স নিয়েই দিলাম ছুট, মাকে কনডাক্টর আগেই নামিয়ে দিয়েছে। আমি ওপর থেকে গোলগাল রকস্যাকটা পাড়তে গিয়ে বুঝলাম হাইটটা বেশ উঁচু, সাহায্য

চাই। সাহায্য চাইতে গিয়ে খেলাম ধমক, *জান কি ফিক্র নেহি হ্যায়, সামান কি ফিক্‌র হ্যায়*। সহযাত্রীর কথায় লজিক আছে, লাফিয়ে নামলাম বাস থেকে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সবাই ভাবতে লাগল বম্ব কখন ফাটবে!

আমি ভাবতে লাগলাম টাকা আর টিকিটগুলো নাহয় রইল আর বুকিংতো সবই অনলাইনে করা, কিন্তু এক জামায় পুরো ট্যুরটা চলবে কি করে? উদয়পুরের আগে শপিংমল পাব কি? আজকের ট্রিপেরই বা কি হবে? চিতোরগড় দেখার টাইম পাব তো? এখনই তো দশটা!

বাস থেকে ধোঁয়া বেরনো বন্ধ হতে কনডাক্টরকে আসল কারণটা জিজ্ঞেস করলাম, শুনলাম ইঞ্জিন গরম হয়েছিল, তবে বাস আর যাবে না। এটা ট্যুরিষ্ট বাস নয়, তাই লোকাল সহযাত্রীরা প্রাইভেট বাস বা ট্রেকার নিয়ে কাছাকাছির ডিসট্যান্সে চলে যাচ্ছে। কনডাক্টর আমাদের ওসবে উঠতে মানা করল, রোডওয়েজের বাস আসছে, ও আমাদের তুলে না দিয়ে যাবে না। কনডাক্টর কথা রেখেছিল।

ভীড়ে ঠাসা বাসে মাকে জায়গা দিলেও ভীলওয়াড়ার আগে আমি বসতে পেলাম না। বসলেও রকস্যাক রাখার জায়গা নেই, ওটা আমার কোলে। আরও দু-তিন ঘন্টার সফর শেষে পৌঁছলাম চিতোরগড়ে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে অটো নিয়ে চললাম আর.টি.ডি.সি.র হোটেল পান্নায়। ধাত্রী পান্নার নামে এই হোটেলের নাম, এটি একটি কমফোর্ট হোটেল

মানে বাজেট হোটেল। দোতলায় একখানা ঘর পেলাম, ম্যানেজার জানালো আড়াইটে নাগাদ অটো ছাড়বে বোর্ডারদের চিতোর ঘোরাতে, লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড দেখিয়ে ফেরত আনবে। যাক্ বাবা খুব দেরী হয়নি তবে। দুপুরে লাঞ্চ করেই বেরতে হবে। ম্যানেজার পইপই করে বললেন, খুব গরম কাপড় নিতে আর গ্যালারির নীচে বসে লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড দেখতে, নইলে মাতাজির ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

অটো ছুটল শহর ছাড়িয়ে চিতোর গড়ের দিকে, একটা নয় তিন-চারটে। খুব শীগগিরি পাকদণ্ডী বেয়ে অটো পৌঁছে গেল চিতোরগড়ে, দশ টাকা দিয়ে টিকিট নিলাম। এটি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার দ্বারা রক্ষিত, তাই টিকিটের দাম এত কম।

চিতোরের ইতিহাস ‘পদ্মাবতী’ মুভির দরুন সকলেরই অল্পবিস্তর মুখস্থ, আর যাঁরা আরও একটু পড়াশোনা করেছেন ইতিহাস নিয়ে – তাঁরা আরও জানেন। তবে ভ্রমণকাহিনী লেখার দরুন যতটুকু না বললেই নয়, ঠিক ততটাই বলব।

দুর্গের ভিতর অনেকগুলি পয়েন্ট, প্রথম পয়েন্ট হল কুম্ভ প্যালেস, দ্বিতীয় পয়েন্ট বিজয় স্তম্ভ, গোমুখ কুণ্ড ও মহাসতীস্থল, এখানেই জ্বলেছিল রাণী পদ্মিনী ও রাজপুত নারীদের চিতা। এই পয়েন্টটা দেখতে অনেক সময় লাগে, কারণ গোমুখ কুণ্ডে উঠতে ও নামতে গেলে অনেক সিঁড়ি

ভাঙতে হয়। অনেকে স্তম্ভেও ওঠেন। এখানে একটি শিবমন্দিরও আছে আর বিকালে এখানেই বসে লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ডের আসর। চিতোরগড় বললেই যে পরিখা ঘেরা দুর্গের ছবিটি ওয়েবসাইটে আসে, তা এই পয়েন্টেরই ছবি।

চিত্র পরিচয়ঃ চিতোরগড়ের গোমুখ কুণ্ড, জহরের আগে রানি পদ্মিনী ও রাজপুত নারীরা এখানেই স্নান করেছিলেন...

বিজয় স্তম্ভ সম্বন্ধে আলাদা করে না লিখলে লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে। মহারাণা কুম্ভ গুজরাট ও মালওয়ারের যৌথ সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করে এই স্তম্ভ নির্মান করেন।

এর পরের পয়েন্ট হোল কুম্ভশ্যাম মন্দির ও মীরাবাঈয়ের গিরধর গোপালের মন্দির। জহর আর পদ্মাবতীর মহিমায় অনেকেরই স্মরণে নেই যে মীরাও ছিলেন মেবারের রানি। এই কুম্ভশ্যাম মন্দিরেই উঠতো তাঁর ভজনের সুর। ... ক্রমশ ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১০)

সময় যখন পিছুটান মারে তখন হয়তো পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। রঞ্জনার ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হল না। সংসারের সাথে সাথে হঠাৎ অফিস থেকেও সে ছাঁটাই হয়ে গেল। দুদিন বাদে মহালয়া – দেবী পক্ষের সূচনা। চারিদিকে সাজ সাজ রব। শরতের আকাশে মেঘবালিকাদের ভাসাভাসির খেলা। সেই আকাশের কোন এক কোণে শহুরে দূষণ যেমন কালি মেখে থমথমে মুখে জমাট বেঁধেছে, সেই রকম কালিমা রঞ্জনার আগের লাবণ্যকে সযত্নে ঢেকে দিয়েছে। গত কয়েক দিন, সে মামার অগোচরে বহুবার জয়কে ফোন করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি, জয় কখনও ফোন ধরেনি, আবার কখনও ফোন ধরে অল্প কথা বলার পরেই ফোন কেটে দিয়েছে।

আজ শেষ বারের মতো ফোন করবে বলে মনস্থির করল রঞ্জনা। ফোন করতে যাবে, ঠিক সেই সময় সে পিছন থেকে খুব পরিচিত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। চমকে উঠল রঞ্জনা। পিছন ঘুরে দেখে মহেশ রায়। সেই এক ব্রাউন ব্লেজার পরা, হাতে সিগারেট, চোখে ব্রাউন লেন্স। মহেশ রায় যে ব্রাউনটা একটু বেশি পছন্দ করে, তা কম-বেশি ফুটবল দলের সবাই জানে। অনুমতি ছাড়াই রঞ্জনার ঘরের সোফাতে পায়ের ওপর পা তুলে সে বসে আছে। তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়ে

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ফিকফিক করে হেসে মহেশ বলল – "মাই ডিয়ার রঞ্জা, কেন এখনও বেকার হাঘরেটার জন্য আকুল হচ্ছো? তোমাকে কত করে তখন বলেছিলাম তুমি আমার সাথে থাকো। তুমি শুনলেনা। দেখো, পঙ্গু হয়ে তোমাকে ছেড়ে দিল। আমার সাথে থাকলে কি তোমার এই দিনটা আসত? আজ একটু আগে জয়ের কাছে গিয়েছিলাম। এই অবস্থাতেও কি দেমাক! মহেশদা যে এতো দিন ওর পাশে ছিল, সে কথা সে ভুলেই গিয়েছে।

ওর পারসোনাল কটা জিনিস আমার কাছে ছিল, তাই ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। কোন কথাই বলল না। রঞ্জনা এখনও সময় আছে, তুমি যদি চাও — আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাকে ম্যানেজমেন্টের কাজে নিযুক্ত করে দিতে পারি। তুমি তো জানো সবার জন্য আমার একটু বেশি দয়া। তবে জয়ের প্রতি কোন দয়া নেই আর। ও তোমার সাথে এটা করতে পারেনা। রঞ্জনা তুমি যদি চাও আবার নতুন করে..."

এতক্ষণ রঞ্জনা নির্বাকভাবে বসেছিল। মহেশ যখন কোন উত্তর না পেয়ে উঠে চলে যাবে, ঠিক সেই সময় রঞ্জনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল — "হ্যাঁ মহেশ তুমি ঠিক বলেছো। আমি বৃথা সম্পর্কটা বাঁচাতে চাইছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। জয় বদলে গিয়েছে। আমি কাল তোমার বাড়ি যাবো, সেখানে গিয়ে সব বলব। অনেক কথা আছে।" মহেশ বলল — "কাল সন্ধ্যেবেলা এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। এই আমার নতুন ফ্লাটের ঠিকানা।"

...ক্রমশ ■

কাল্পনিক

প্রণব কুমার বসু

হাসি হাসি মুখে সব ঘোরাঘুরি করছে
রাস্তায় পড়ে গেলে হাত ধরে তুলছে...
খাওয়া দাওয়া একসাথে ছোট থেকে বুড়োরা
দাদু কাকি পাশাপাশি তার পাশে খুড়োরা।

একদল ঘুড়ি নিয়ে আকাশেতে ওড়ালো
ব্যাট দিয়ে ছয় মেরে টুপি খুলে তাকালো...
ইস্কুলে পড়াশোনা করে ঠিক সব্বাই,
দুপুরের টিফিনেতে ভাগাভাগি করা চাই।

বাড়ি ফিরে খেলা করে দাদু আর দিদিমা
লুডো খেলে হেরে গিয়ে কাঁদে কেন পিসিমা!
স্কুল ছুটি - চলে যায় জঙ্গলে পাহাড়ে
শোভা দেখে বলে সব - মরে যাই আহা রে...
সারাদিন খাটাখাটি রাত্তিরে ঘুমনো
নতুন বছরে যেন সবই চোখ জুড়নো। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

আশা
আশা
আশা
আশা
আশা
আশা
আশা
আশা

পথ ও শপথ

নাহার আলম

সেদিনও ঝিলভরা বিলে ছিল অগুনতি শাপলার
মোহন সুরভি, বড়ো চঞ্চল;
সেদিনও জোনাকির মিঠে আলোর পলকায়
মেলেছিল রেহেনার আলগা করবী, সৌন্দর্যে বিহ্বল!
আজ এখানে এখন গজিয়ে উঠেছে কর্পোরেট নগর,
ভীষণ ঝলমল...
এখানে এখন সকল কাজের আবডালে অন্য মিথ্যেরা হেঁটে
চলে, জলের মতো কলকল।
এই তো মনে পড়ে বেশ -
ঠিক সেদিনের কথা, তুমি ছিলে কত সাবলীল আমাদের
ভীড়ে, আজ যা নীরব ক্লেশ।
তোমাকে জেনেছিলাম আমি দেশ ও দশের অবিভক্ততায়।
তবে, জানা হয়নি আজও কাঁটাতারের রহস্য,
হয়তো বিষম তিক্ততায়।

দৈনিক নিয়মের পাঠে জেনেছি,
পথেরা আসেনা কখনো কাছে,
আমরাই বরং যাই পথের কাছে।
কঠিন জীবনের মাঠে বুঝেছি,

জিয়নকাঠি

ভুলেরা পারে না শুধরে নিতে,
যদি না- নিজেরাই না চাই কিছু শিখতে...
সময়ের বিউগলে বাজবে কি আদৌও আর এ তল্লাটে
কোনোদিন একই সুরের গান?
প্রেমের মিহি সুতোয় গাঁথা কি হবে,
সব মনের মিলনে একটিমাত্র মালায়
"এক মন এক প্রাণ"?
কি জানি! বাস্তুচ্যুত ফাঁদের আঁধার পেরিয়ে মিলবে কি
আমাদের অভিন্ন জীবন যুগ্মতার মধুর কলতান?

শংকা আছে জানি ঢের, তবুও তো আশা রাখতে চাই -
চলো না, নতুন শপথে আবারো নতুন কোনো পথে একসাথে
বহুদূর পথ হেঁটে চলে যাই... ■

নিবন্ধ

সার্থকতার সন্ধানে

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

আশা শব্দটা বড় মায়াময়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট সংসার-জীবনে বড় প্রয়োজনীয় এক শব্দ। আশার মূল উদ্দেশ্য দুঃখের বাস্তবতাকে ভুলিয়ে সুখের সহনযোগ্য মায়াময়তা গড়ে তোলা।

একটি দৃশ্যের কথা ধরা যাক। একটি শান্ত বিকাল। ট্রেন ছুটে চলেছে ঊষর মাঠ, নিরক্ত আকাশ, আর কৃষ্ণজনপদ ভেদ করে। মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে ফুলচাষের ক্ষেত, রক্তবিন্দুর মত জবা, পরিণতির মত রূপালি কাশ। নয়ন নামের একটা মানুষ তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। কেন দেখছে না? তার তো প্রকৃতি অতি প্রিয়, সে প্রকৃতিরই সন্তান। কিন্তু তাও আজ কিছু গোলমাল আছে। গোলমাল ব্যাস, যেমনটা বলত তার বন্ধু কমল, মেজাজ খারাপ হলে বলত, ব্রেনের কিডনীটা ঠিক কাজ করছে না। নয়নের ব্রেনটা আজ ঠিক কি কারণে অকার্যকর, সেটা নয়ন নিজেও ঠিক জানে না। জানার চেষ্টাতেই আসলে কিডনীটা গেছে বলে মনে হয়। আসলে তার মন খারাপ।

—"মন কেন ভালো নেই?"

—"ভাই মনখারাপ, আয় তোর সাথে দুটি গল্প করি।

মনখারাপের সাথে কথা বল্লে, মনখারাপেরও কিছু ভালো লাগে, এইটা সে দেখেছে। কিছুদিন যাবত তার নানা কারণেই মেজাজ তিরিক্ষে। এই যে তার কাছের বন্ধু পমেটমলাল, তাকে জানিয়ে শুনিয়ে আজেবাজে ঠাট্টা করে, তারপর সে রেগে গেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভাব করতে আসে... তার জন্যে যতটা, তার থেকেও বেশি এই কারণে যে – যে হরিহরপাড়ার ডুগডুগিরাম তাকে কলার খোলা ফেলে ইচ্ছে করে আছাড় খাওয়াল গেল বর্ষায়, সেই দেঁতো ডুগডুগিরামের সাথে কান এঁটো করা হাসি হেসে ঝণ্টিপাড়ার ফুটবল দেখতে গেল পমেটমলাল। তারপর তাকে বোঝালো, "আরে ও তো আমার পাড়ার ছেলে, ওর সাথে দুটো কথা না বললে চলে?"

আসলে নয়ন জানে ডুগডুগিরাম পমেটমকে মেলা সুবিধে দেয়। এই যেমন, রেশনের চালের দামে সে বাজারের বাসমতী পায়, ডুগডুগির হোটেলে পমেটম নিত্য চপ-কাটলেট হাঁকায়। এসব তো নয়ন পারবে না কোনদিন, তাই ডুগডুগির কাছে সে হেরেই যাচ্ছে, তার আশা পরাভূত হচ্ছে।

"– এই কারণেই কি তোমার দুঃখ?" মনখারাপ প্রশ্ন করলে।

নয়ন একটু থমকে গেল। "এই কারণে! তা এটা কি বেশ একটা কারণ নয়?"

"তাই?" কৌতুকভরে বলল মনখারাপ। রেগে উঠল নয়ন, "কি বলতে চাইছিস? – যখন পমেটম তোমায় নিয়ে মজা করে, আর তোমার মতে, আজেবাজে লোকের সাথে ভাব রাখে, তাহলে তুমিই

বা পমেটমের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে কেন?যে বন্ধুত্বে নির্মলতার রেশ থাকে না, সেই বন্ধুত্ব থেকে সুখের আশা কি বোকামো নয়?"

জীবনে এই ডুগডুগি বা পমেটমলালের মত লোকেদের চিনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই হোক নতুন বছরের নতুন আশা, যা দুঃখের বাস্তবতাকে অস্বীকার না করেও, শান্ত-সমাহিত স্থৈর্য্য এনে দেবে জীবনে। ■

পথের শেষে

সুচিতা সরকার

ফেরার পথটি অতি সংক্ষিপ্ত...
প্রশস্থ রাস্তার ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে,
সারি সারি স্মৃতির ঝোপ।
বক্ষে আঁকে শোণিত রেখা,
প্রতিপদে স্মৃতির কন্টক।
বিলীন হয়েছে সকল মূর্তি
একদা যারা জুড়েছিল পথ...

ফিরে চাই তবু,
কুয়াশা মাখা চোখে
হয় না আর কিছুই প্রত্যক্ষ...

অতিবাহিত সময়ের স্রোতে
নিজেরে ধরে রাখা বড় দায়।
সংকীর্ণ পথের পরে
নববৃহৎ রাস্তায় আমারে সে ভাসায়...

অনেকখানি পরিণত
অনেকখানি সংযত,
আকাশের নীল রঙ ছুঁয়ে মন পালায়।
কিছু আনকোরা বাঁক পেরিয়ে,
নব্য কিনারা ধরে জীবন এগিয়ে যায়... ■

আবছা আলোর আলপনা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

মাঝে মাঝে যখন তোমার ছবিটা দেখি
সমস্ত পৃথিবীটাই তখন মনে হয় মেকী।
মনে মনে হাসি, আর হাসতে হাসতে কাশি।
এ পৃথিবীর সব কিছুই যে এখন বাসি।

আমার হৃদপিণ্ডে বসান হয়েছে ছোট্ট একটা যন্ত্র।
সেটাই এখন চালিয়ে যাচ্ছে আমার জীবনতন্ত্র।

মাঝে মাঝে যখন তোমার ছবিটা দেখি —
জানলার গ্রীলে বসে থাকে বিশ্রান্ত এক পাখি,
চপলতাহীন, এক অদ্ভুত অবসন্ন নীরবতায় লীন...
তার ঈশারায় বুঝি, পৃথিবীতে আজ সবই অর্থহীন।

এ দেহ পরিণত হতে চলেছে অঙ্গারে।
জানো, আমার সাইকেলটা চলে গেছে ভাঙ্গারে,
এখন কোন কারণে উত্তেজিত হওয়াও বারণ।
আর অবশিষ্টই বা আছে কোন অত্যুচ্ছাসের কারণ!

তোমার ছবিটা সামনেই – আমার লেখার টেবিলে থাকে।
তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, সময় আবার পিছন থেকে ডাকে।

স্মৃতির পথে

পিছন ফিরেতো কাউকেই দেখিনা!
সামনে চলার সাথিও যে খুঁজে পাইনা।
মনে মনে ভাবি নিরাশায় রাঙা ছবি...
এ এক অদ্ভুত অহেতুক সময়ের প্রবঞ্চনা।

হারিয়ে গিয়েছে হৃদয়ের যত সুর,
তোমার ঠিকানাও চলে গেছে বহুদূর।
তবুও তোমার হাসি,
আমি আজো ভালবাসি।
এক দিকে নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনের অনুচ্চারিত যন্ত্রণা,
তারি পাশাপাশি, সে যেন এক আবছা আলোর আলপনা... ■

চিত্রগ্রাহক — অনির্বাণ বসু

"আমার একরাশ শূন্যতার যাত্রাপথে
তোমার স্মৃতির ভিড়, ভোরের আলোর সাথে।"

বোন

স্বাগতা পাঠক

চায়ের দোকানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত ১০ টা বাজে, বছর ষোলোর বিশুর। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর ছোটো বোনকে নিয়েই বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশুর পৃথিবীটা সীমাবদ্ধ। মা লোকের বাড়ি বাসন মাজে। আর বিশু চায়ের দোকানে কাজ করে। মাঝপথেই ওর পড়াশুনাটা বন্ধ হয়েছিল, তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ত।

তারপর কেটে গেছে বেশ কতগুলো বছর। কিন্তু এখনও এত বছর পরও স্কুলের বইগুলো সে যত্ন করে রেখেছে, রোজ বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর যখন ওর ঘুম আসে না, পুরনো বইগুলোই পড়তে থাকে। ক্লাস ফাইভের সব বই যেন ওর জল ভাতের মতো মুখস্থ। ওর বো্নটা এখন ক্লাস সিক্সে উঠল। আগে মাঝে মাঝে বোনের পাশে বসে বোনকে পড়া বুঝিয়ে দিত বিশু।

এখন ওর বোন উঁচু ক্লাসে উঠেছে, এখনতো ও আর পারবে না তাকে পড়া বোঝাতে।

রাতে সকলের ঘুমিয়ে পড়ার পর, বিশু রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ওর বোনের বইগুলো নিয়ে পড়ে। ওর বড্ড লজ্জা করবে যদি বোন দেখতে পেয়ে হাসে। সব কিছু

জাগরণ

আশা শেষ হওয়ার পরও যেন বিশু কিছুতেই সব শেষ ভাবতে পারে না।

মাঝপথে অভাবের সংসারে ওকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল, সেই যন্ত্রণা সে তার বোনকে কোনো ভাবেই পেতে দেবে না, নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও সে তার বোনকে একজন শিক্ষিত মানুষ হিবেসে গড়ে তুলবে। তাই তো রোজ যুদ্ধ করে চলা এই জীবনের সাথে।

দেখতে দেখতে কেটে যায় জীবন, পেরিয়ে যায় কুড়িটা বছর, জীবন পাল্টে যায় জীবনের মতো করে। সাথে পাল্টে যায় সমস্ত পরিস্থিতি। বিশু আজ আর বিশু নয়, বিশ্বনাথ দাস আজ একজন বিখ্যাত মানুষ। সমাজের পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন। শুধু দেশ নয়, বিদেশের মাটিতেও সে নিজের নিদর্শন রেখে এসেছে। গাড়ি বাড়ি আজ সব কিছাই আছে তার। সে আজ সমাজের সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল বিশ্বনাথ দাসের চর্চা। একজন অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বক্তা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে সে। যে প্রমাণ করে দিয়েছে জীবনে স্বপ্ন দেখতে গেলে শুধু মনের জোর আর প্রবল ইচ্ছেটাই দরকার। স্বপ্ন তোমার কাছে এসে ধরা দেবে। আর বিশুর স্বপ্ন ছিল একজন শিক্ষিত মানুষ হওয়ার। আর যেটার জন্য ওকে কোনো স্কুল কলেজের ডিগ্রির উপর নির্ভর করতে হয়নি। সে প্রমাণ করে দিয়েছে,

নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শুধু মাত্র, প্রকৃত শিক্ষাটাই দরকার। সমাজ আজও শিক্ষিতদের কদর করতে পারে। তবে যুদ্ধটা কঠিন, কিন্তু জিতে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

বছর কুড়ি আগে, সেই রাতের একটা সামান্য ঘটনা পাল্টে দিয়েছে বিশুর জীবন অভূতপূর্বভাবে। সেদিন রাতে সকলের ঘুমিয়ে পড়ার পর, দর্মার বেরা দেওয়া ঝুপরির ঘরের বারান্দায় কোণে বসে, ল্যাম্পের আলোতে বিশু ওর বোনের বইগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎই ওর বোনের ঘুম ভেঙে যায়, দাদাকে ওই ভাবে মনোযোগ সহকারে বই পড়তে দেখে, সেদিনের বাচ্চা মেয়েটি বুঝেছিল, নিজের বুকে হাজার স্বপ্নের কবর বানিয়ে তার দাদা তার জন্য অট্টালিকা গড়ছে। অভাবের সংসারে বুঝি বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো খুব অল্প বয়েসেই অনেক বড় হয়ে যায়। সেই রাতে চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল বীনার। দাদার কাছে গিয়ে দাদার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, “দাদা তুই পড়বি? আমি তোকে পড়াব, আমার স্কুলে যা যা পড়া হবে আমি রাতে তোকে এসে বুঝিয়ে দেব।”

সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল দুই ভাই বোনের জীবন যুদ্ধ। সেই গভীর রাতের অন্ধকারেও বিশুর জীবনে এসেছিল হাজার সূর্যের আলো। না বীণা শুধু দাদাকে পড়ায়নি, নিজেকেও জীবনে একজন সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

জাগরণ

বীণা দাস আজ একজন সফল মানুষ, কলকাতা শহরের একটি স্বনামধন্য কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা।

আজ তার দাদা কলকাতার সব থেকে দামী হোটেলে কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছে, আর সামনের সারিতে বসে চোখের কোণে ছলকে যাওয়া জল আঁচলে মুচছে বীণা দাস।

সব কথাগুলো যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, বীনার চোখের সামনে ভেসে উঠছে শৈশব। শুধু কানে ভেসে আসছে বিশুর গলা, শেষ কথাগুলো যেন বীনার বুকে আঁচড় কেটে যাচ্ছে "আমার জীবনের অন্ধকার কাটিয়ে প্রথম আশার আলো নিয়ে যে আমাকে আবার বাঁচতে শেখায় সে আর কেউ নয়, আমার বোন।" ■

সুস্বাগতম ২০২০

ইংরাজি নববর্ষের প্রারম্ভে
সকল পাঠক-পাঠিকাকে
আমাদের তরফ থেকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বই মেলায় নতুন বই

গত ২৯ শে জানুয়ারী, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত 'রহস্যের ৬ অধ্যায়' বইটির আবরণ উন্মোচন করলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ওপার বাংলার সুবিখ্যাত লেখক ও প্রকাশক জনাব শামসুদ্দিন শিশির (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন দুই বাংলার প্রিয় লেখক (রসরাজ) শ্রী পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়।

শিশু
মনের
হালখাতা

শাস্তি

দোলা ভট্টাচার্য

ওরা মনে হচ্ছে ক্ষমা করবে না আমাকে। কি শাস্তি দেবে আমায়? ওই লোকটাকে আমি যে ভাবে শাস্তি দিয়েছি, ঠিক সেই ভাবে! কি জানি! আচ্ছা! লোকটাকে ওরা সবাই মিলে কোথায় নিয়ে গেল! এখন কি ফিরে এসেছে? তাহলে সামনে আসছে না কেন!

যখন তখন এসে তো আমাকে জ্বালায়। আসলে বাবুর সব বীরত্ব উবে গেছে। দিয়েছি মাথায় এমন কামড়, একেবারে ঘিলু বার করে ছেড়ে দিয়েছি। ইস্! কি বিশ্রী স্বাদ! এখন ওরা আমাকে একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

আসলে ওরা ভয় পেয়েছে খুব। আমাকে এভাবে রেগে যেতে তো কখনও দেখেনি। কি করব! ও আমাকে এমন রাগিয়ে দিল, নিজেকে সামলাতে পারিনি। ওই একটা কালো রঙের জামা পরে সব সময় আমাকে ভয় দেখাবে। কতবার আপত্তি করেছি। ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিয়েছি জামাটা।

দুদিন বাদেই আবার একটা কালো জামা। জামা কালো, বন্দুক কালো। কি পেয়েছে আমাকে! ওর কথা আমাকে শুনতে হয়। ওর কথায় আমাকে উঠতে হয়, বসতে হয়। এটা আমার ডিউটি। তা বলে ভয় দেখাবে আমাকে! এবারে দ্যাখ, আমি ভয় দেখালে কি হয়।

আশ্রয়

এখন চারদিক খুব চুপচাপ। কেউ বাইরে নেই মনে হচ্ছে। গেল কোথায় সব! আজ আমাকে কেউ খেতেও দেবে না নাকি! বড় খিদে পেয়েছে যে। ওরা সবাই বোধহয় পরামর্শ করছে, কি ভাবে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। অবশ্য ভালো মানুষটা এসে পড়লে ওরা আমাকে আর শাস্তি দিতে পারবে না। কোথায় আছো গো তুমি ভালো মানুষ! আমার যে তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি তো এখানেই রয়েছ, অথচ আমার কাছে আসছ না। কেন? কি করেছি আমি? ওই লোকটাকে আজ সবাই যখন আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনও তোমাকে দেখেছি আমি। সবার মতো ওই লোকটাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলে তুমি। আমি কত কাঁদছিলাম সে সময়ে। একবারের জন্যও ফিরে তাকালে না আমার দিকে। তারপর কারা যেন এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজনের হাতে বন্দুক রয়েছে। ওই বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল লোকটা।

রাগের চোটে ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর মাথাটাও অমন চিবিয়ে দিই। কিন্তু ওরা আমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। আমি নড়তে পারছিলাম না। তারপর! তারপর কি হল, আর কিছু আমার মনে নেই। উঃ! এখন যে বড্ড খিদে পেয়েছে। আরে! ওই তো লালি আসছে। ওর হাতে খাবারের থালা। এদিকেই আসছে ও। ওকেও আমি খুব একটা পছন্দ করি না। মাঝে মধ্যেই খাঁচার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে

খোঁচা মারে ও। আমি রেগে যাই। আর তাতেই ওর আনন্দ। কিন্তু ওকে আমি কিছু বলি না। ও যে আমার ভালো মানুষের বন্ধু। তাই ওর সাত খুন মাফ। হ্যাঁ। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, লালির হাতের খাবারটা আমারই জন্যে আনা। ঘেঁয়াও! করে একটা আনন্দের ডাক ছাড়লাম। ভয় পেয়ে গেছে লালি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই রে! ও যদি খাবারটা না দিয়েই পালায়! না না। থালা হাতে ও এগিয়েই আসছে। কোনোরকমে খাঁচার ভেতর খাবারটা ঢুকিয়ে দিয়েই পালালো লালি। বাব্বাঃ! যা খিদে পেয়েছিল। এইবারে শান্তি। বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে এখন। কিন্তু কোনদিনই আমার খাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পায় না। তাহলে আজ এরকম হচ্ছে কেন!

মালহোত্রা সাহেবের সার্কাসে বাঘিনি জিরানের খেলাটা ছিল বেশ চমকপ্রদ। সব খেলার শেষে এই খেলাটা দেখাত রিংমাস্টার আবদুল। জিরানের সঙ্গে খেলতে খেলতে একসময়ে নিজের মাথাটা ওর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিত আবদুল। রুদ্ধশ্বাসে সময় গুনত দর্শক। ঠিক দশ সেকেন্ড পরে মুখ খুলত জিরান। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াত আবদুল। হাততালিতে ফেটে পড়ত অডিয়েন্স।

কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেল আবদুল। সেই জায়গায় এল জাভেদ। সার্কাসের পশু-পাখিগুলোকে বড় ভালোবাসত আবদুল। হাতে লাঠি বা চাবুক থাকলেও, সেগুলোর প্রয়োগ করতে হত না ওকে।

না-মানুষের দলও ওকে ভালোবেসেই ওর সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। জাভেদ ছিল অন্য প্রকৃতির। লাঠির ব্যবহারটা ও একটু বেশিই করতে ভালোবাসত। পশু পাখি গুলো ভয় পেত, বিরক্ত হত ওকে দেখে। এই ভয় আর বিরক্তি থেকেই ঘটে গেল অমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা।

সেদিন দুপুরের শো - এর আগে থেকেই জিরানকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। জাভেদের সেদিনই ছিল শেষ শো। ছুটির মেয়াদ শেষে আবদুল ও ফিরেছিল সেদিন। পরের দিনই আবার কাজে যোগ দেবে ও। ফেরার পর জিরানের সঙ্গে আর দেখা করেনি আবদুল। কারণ, ওকে দেখলে আর জাভেদের সঙ্গে খেলতে চাইবে না জিরান। জিরান কিন্তু কোনো এক ফাঁকে দেখেই নিয়েছিল আবদুলকে। তারপর থেকেই ওর মন খারাপ। ভালোমানুষটা কেন এল না আমার কাছে! জাভেদকে ও আর সহ্যই করতে পারছে না। খেলার সময়ে জাভেদ ও বুঝতে পারছিল, জিরান আজ খেলতে চাইছে না। কিন্তু ওর হাতের চাবুককে অস্বীকার ও করতে পারছে না। তারপর এল সেই ভয়ংকর মুহূর্ত, খেলার অন্তিম পর্যায়।

জিরানের সামনে এসে দাঁড়াল জাভেদ। জাভেদের কাঁধের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল জিরান। জাভেদের মুখের সামনে জিরানের মস্ত হাঁ করা মুখ। নিজের মাথাটা ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল জাভেদ। মুখ বন্ধ করল জিরান। দশ সেকেন্ড কেটে গেল। মুখ খুলল না জিরান। আরও পাঁচ

সেকেন্ড কাটল। দর্শকাসনে বিরাজ করছে মৃত্যুপুরীর নৈঃশব্দ। ছুটে এল আবদুল। নাঃ! দেরি হয়ে গেল বড়ো। কড়মড় করে হাড় চিবানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তখন। জিরানের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। জাভেদের হাত থেকে খসে পড়া চাবুকটা তুলে নিয়ে পাগলের মতো ওকে মারতে থাকে আবদুল। তবু মুখ খোলেনি জিরান। বিষম ত্রাসে দিশাহারা দর্শক, ছোটাছুটি ধাক্কাধাক্কিতে অনেকেই আহত হন। সার্কাস কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় সকলেই বেরিয়ে আসেন বাইরে। চাবুকের আঘাত খেতে খেতে একটা সময়ে জাভেদকে ছেড়ে দিয়ে আবদুলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে জিরান। ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে আগে ঘুম পাড়ানো হয় ওকে। তারপর লোহার চেন দিয়ে বেঁধে খাঁচায় ঢোকানো হয়।

আবদুল বুঝতে পারছে, জিরানের কি পরিনাম হতে চলেছে। কোনো ভাবেই ওকে বাঁচতে দেবেনা এই সার্কাসের মালিক, সুজন মালহোত্রা। একটু আগেই মালহোত্রা সাহেবের তাঁবুতে ডাক পড়েছিল ওর। ভেতরে তখন একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি চলে যাবার উদ্দেশ্যে। যাবার আগে মালহোত্রা সাহেবের সঙ্গে আর একবার করমর্দন করে বললেন, তাহলে ওই কথাই রইল। আপনার সুবিধা মতোই কাজ করবেন আপনি, আর বাইরের ব্যাপারটা আমি সামলে নেব।

অফিসারের বুকপকেটে একটা সাদা রঙের পুরুষ্টু খাম আবদুলের নজর এড়াতে পারে নি। ওর দিকে তাকিয়ে মালহোত্রা সাহেব বললেন, দশ মিনিটের মধ্যে সকল স্টাফকে নিয়ে এখানে এসো আবদুল। কথা আছে। যন্ত্রের মতো আদেশ পালন করে আবদুল।

সকলের সামনে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মালহোত্রা সাহেব। জিরানের মৃত্যুদণ্ড বহাল হল। আবদুল দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেছিল, স্যার! ওকে ক্ষমা করা যায় না? অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুজন মালহোত্রা, তুমি কি আর কিছু বলবে? হ্যাঁ! বলবো স্যার। অনুমতি দিন।

– বেশ। বলো।

আবদুল বলে, মানুষ যদি খুন করে, তাহলেও সব ক্ষেত্রে তাকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেওয়া হয় তাকে। ওই প্রাণীটার কথা আর একবার কি ভাবা যায় না স্যার!

চারপাশ থেকে গুঞ্জন উঠল, ওই বাঘ এখন মানুষ খেকো হয়ে গেছে। ওকে মেরে ফেলাই ভালো। এবার একটু নরম সুরেই বললেন সুজন মালহোত্রা, তোমার অবস্থা টা বুঝতে পারছি আবদুল। এতদিন ধরে তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। সেজন্য তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভাবো, কতখানি লোকসান হল আমার। এখানে একমাস

খেলা দেখানোর কথা ছিল। দেখালাম মোটে চারদিন। কালই আমাদের এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যেতে হবে। আর এই যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া, এতগুলো কর্মী, পশু পাখি, লটবহর নিয়ে। তার ও রয়েছে একটা বিশাল ব্যায়ভার। এগুলো ভাবছোনা? অন্য কারো কাছে ওকে বিক্রি করে দিন না স্যার। শেষ চেষ্টা করে আবদুল।

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন সুজন মালহোত্রা, বিক্রি! কে নেবে ওই মানুষ খেকো কে! আবদুল জানে জিরানের মতো নিখুঁত একটা বাঘিনিকে বিক্রি করলে, অনেক দাম পাওয়া যায়। কিন্তু ওর গায়ে যে মানুষ খেকোর কলঙ্ক লেগেছে। তাই মনোমতো দাম পাওয়া যাবে না। সুজন মালহোত্রা লোকটা ভয়ংকর অর্থ পিশাচ। যা ভেবেছে, সেটাই করবে ও।

তাঁবুর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে খোলা মাঠে বসেছিল আবদুল। জিরানের কথাই ভাবছিল ও। বছর আষ্টেক আগে, মালহোত্রা সাহেবের দল মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিল খেলা দেখাতে। খেলা দেখে খুশি হয়ে রেওয়ার রাজ পরিবার ছোট্ট জিরানকে তুলে দিয়েছিল সুজন মালহোত্রার হাতে। জিরান নামটাও রেওয়ার রাজকুমারের দেওয়া। জিরানের সঙ্গে এসেছিল আবদুল, ওকে দেখাশোনা করার জন্য। আবদুলের হাতেই একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠেছে জিরান। অবোধ প্রাণীটার জন্যে ব্যাথায় ভরে উঠেছে ওর মনটা। শুধু মনে হচ্ছে, এ ঠিক নয়, ঠিক বিচার হচ্ছে না। জিরানকে মানুষ খেকো

বলতেও ওর মন চাইছে না। কারণ, যে সময়টা ও পেয়েছিল, তাতে জাভেদের মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে খেয়েও নিতে পারত। তা করেনি জিরান। ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি জাভেদের মাথা।

অন্ধকারে নিঃশব্দে ওর পাশে এসে বসল লালি। কি ভাবছিস আবদুল? জিরানের কথা নিশ্চয়ই?

– হুঁ। আমরা কি ওকে কোনও ভাবেই বাঁচাতে পারব না? অসহায় ভাবে মাথা ঝাঁকায় আবদুল, কি করে! কি করে সম্ভব! দুজনেই নিঃশব্দে বসে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। জিরানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। খিদেয় চিৎকার করছে প্রাণীটা। এবেলায় ওকে খেতেই দেয়নি কেউ। হঠাৎ আবদুলের হাতটা আঁকড়ে ধরে লালি, আবদুল! ওঠ। একটা উপায় এখনও আছে। চল আমার সঙ্গে। যেতে যেতে বলছি। কি! কি উপায়?

লালি বলে, এখানকার চিড়িয়াখানার একজন কর্মীর সাথে আমার পরিচয় আছে। ওর সঙ্গে আবার পশু কল্যাণ দপ্তরে কাজ করে এমন একটা লোকের যোগাযোগ আছে। আমরা ওদের সাহায্য নিতে পারি। এতক্ষণে একটু হলেও আশার আলো দেখতে পায় আবদুল।

ভোর পাঁচটা। শৃঙ্খলিত জিরানকে নিয়ে আসা হয়েছে বধ্যভুমিতে। সার্কাসের তাঁবুর পেছন দিক এই জায়গাটা, দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। একটু পরেই সূর্য উঠবে। তারই আভাস রয়েছে আকাশের লালিমায়।

আশ্রয়

খুব অসহায় দেখতে লাগছে জিরান কে। মাঝে মধ্যে ডেকে উঠছে। ওর চোখ খুঁজে চলেছে আবদুলকে। কোথায় তুমি ভালো মানুষ? আমাকে বাঁচাতে আসবে না? এত রাগ করেছো আমার ওপর! সার্কাসের গেটের বাইরে তখন অস্থির ভাবে পায়চারি করে চলেছে আবদুল। সঙ্গে রয়েছে লালি। সংশয়ের দোলায় দুলছে আবদুলের মন, ওরা ঠিক সময়ে আসবে তো লালি! জিরান ডাকছে। বড় করুন শোনাচ্ছে ওর ডাকটা। আবদুলকে শান্ত হতে বলে লালি। ম্যানেজার ভার্গবের হাত থেকে বন্দুকটা নিজের হাতে তুলে নিলেন সুজন মালহোত্রা। নিশানা ঠিক করে লক্ষে আঘাত হানার অপেক্ষা শুধু। দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে রাস্তার ধুলোর ওপরেই বসে পড়েছে আবদুল। আশার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে রেখে লালি তখনও অপেক্ষা করছে। গাড়িগুলো বিসর্পিল গতিতে এগিয়ে আসছিল এদিকে। দেখেই চিৎকার করে ওঠে লালি, ওরা আসছে।

ওঠ আবদুল! উঠে দাঁড়া! আমাদের জিরান বাঁচবে। গাড়ি গুলো একে একে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। পশুকল্যান দপ্তরের গাড়ি, সঙ্গে রয়েছে পুলিশের গাড়ি আর বনদপ্তরের গাড়ি। প্রথম গাড়িটা থেকে একজন নেমে এসে ওদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনারাই কি অভিযোগ করেছিলেন এই সার্কাসের মালিকের বিরুদ্ধে?

হ্যাঁ স্যার। শিগগিরি চলুন। আর দেরি করলে মারা পড়বে প্রাণীটা। উদ্বেগ ঝরে পড়ছে আবদুলের গলা থেকে।

ওদের পেছন পেছন পুরো দলটা এগোতে থাকে বধ্যভুমির দিকে। আবদুল আর লালি এবার ছুটতে শুরু করেছে। ওই তো এসেছে ভালো মানুষ। আবদুল কে দেখেই বন্দুকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল জিরান। ও ভালো মানুষ! আমাকে বাঁচাতে এসেছ তুমি! দেখো তো, কিরকম শক্ত করে আমাকে বেঁধে রেখেছে ওরা। কাল রাতে আমাকে কেউ খেতে দেয়নি। খিদে পেয়েছে বড্ড। ওর সোহাগ মেশানো গরগরে স্বরের মধ্যে দিয়ে কত অভিযোগ ঝরে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে মন দেবার একদম সময় নেই আবদুলের। ও চিৎকার করে ওঠে, থামুন স্যার! মারবেন না ওকে। সুজন মালহোত্রার আঙুল তখন ট্রিগারের ওপর চেপে বসেছে। আবদুলের নিষেধ শুনতে পেয়েও শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না। গুলি চললো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু নিশানা নড়ে গিয়েছিল। তাই গুলিটা বুকে না লেগে গলায় লাগলো জিরানের। পাগলের মত ছুটে গিয়ে জিরানের পাশে বসে পড়ল আবদুল। এত চেষ্টা করেও তোকে বাঁচাতে পারলাম না আমি। ঝরঝর করে দুচোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে আবদুলের। জিরানের দুটি চোখে তখন ভোরের সূর্যের রং জমাট বেঁধেছে। আবদুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে নিস্প্রভ হয়ে আসা চোখ দুটো বন্ধ করল জিরান।

দু বছর পর, জিরান এখন একেবারে সুস্থ। বনদপ্তরের অধীনে জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীন চলাফেরা ওর। মানুষ খায়না জিরান।

দুএকটা হরিণ টরিন মেরে খায়। এখন আবার মাছের নেশা হয়েছে মেয়ের। নদী থেকে মাছ ধরেও বেশ খাওয়া চলে।

বনদপ্তরের চাকরি নিয়ে আবদুলও এখানেই রয়েছে। লালির সঙ্গে ঘর বেঁধে ভালোই আছে ও। সার্কাসের সেই দল কিন্তু ভেঙে গিয়েছে। সুজন মালহোত্রাও জেলে। জিরানের সঙ্গে আবদুলের দেখা হয় মাঝে মাঝে। কাছে আসে না জিরান। কিছুদিন আগেই ও মা হয়েছে। বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় ও লুকিয়ে থাকে দেখতে পায় না আবদুল। জিরান ওর বাচ্চাদের দেখাতে চায় না। আবদুল মনে মনে ভাবে, থাক ও ওর নিজের মতো করে। একটা সুন্দর জীবন যে ওকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশি। আর জিরান! চোখের দৃষ্টিতে ওকে বার্তা পাঠায়, দূরেই থাক ভালোমানুষ। জঙ্গলের নিয়ম তোমাদের থেকে আলাদা। তাই তোমার কাছে যাই না। কিন্তু আজও আমি ভালোবাসি তোমাকে। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**